মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য : মানবতাবাদ

দেবাশিস দত্ত

'মানবতাবাদ' বা 'মনুষ্যধর্ম' শব্দের সমার্থক শব্দরূপে ইংরাজী 'হিউমানিজম্'-এর ব্যবহার বহু প্রচলিত। মানবজাতির মঙ্গলকামনা ; অলৌকিক ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষের জয় ঘোষণা, মানুষের সুখ-দুঃখ-বিরহ মিলনের মধ্যে বাস্তব জীবন আবিষ্কারকেই মানবতাবাদ বলে। এই অর্থে 'হিউমানিজম্' শব্দটি আমরা ব্যবহার করি। কিন্তু অনেকাংশে মিল থাকলেও 'হিউমানিজম' ও 'মানবতাবাদ' সর্বাংশে এক নয়। জার্মান পণ্ডিত নিয়েট্-হামের (Niethammer) ১৮০৮ সালে 'হুমানিজ্‌মুস' (Humanissmus) শব্দটি প্রয়োগ করেন বিদ্যালয়ে গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের পঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে। প্রচলিত কারিগরি বা বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ্যক্রম থেকে এই শিক্ষা ভিন্ন। একটি বিশিষ্ট শিক্ষাক্রম এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'হিউমানিজম'-এর উৎপত্তি রোমান যুগে। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে 'হিউমানিজম'-এর ব্যবহার বেড়ে যায়। এর পূর্বে ইউরোপীয় মধ্যযুগীয় শিক্ষায় প্রাধান্য ছিল ঈশ্বরবিশ্বাস, অলৌকিকতা, খ্রীষ্টিয়ধর্মাদর্শ ইত্যাদির। এই শিক্ষাধারা থেকে ভিন্ন অন্য এক মানব নির্ভর শিক্ষাধারা অর্থে তখন 'হিউমানিজম' শব্দের প্রয়োগ। এটি বিশেষ দার্শনিক ভাবধারা নয়। এ একটি সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা। নবজাগরণের বিশিষ্ট চিন্তাধারাগুলি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে হিউমানিজম-এর অবদান স্মরণীয়। কেননা এই পরিকল্পনা মানুষকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে, নিজেকে ও বিশ্বকে আবিষ্কার করতে শিখিয়েছে। যাই হোক, যে শিক্ষার কথা হিউমানিস্টরা বলেছেন তা আসলে যাজক তন্ত্রের অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষকে মুক্তির কথা শুনিয়েছে। অর্ধেক মানুষ নয়, সম্পূর্ণ মানুষ হবার শিক্ষা দিয়েছে। মুহূর্তে অলৌকিক ঈশ্বরের পৃথিবীটা জ্ঞানের আলোকে অধিকারের কথা বলেছে— সেই অর্থে তাই 'মানবতাবাদ' ও 'হিউমানিজম' শব্দদুটি যমজ ভ্রাতার মত। শুধু রূপে নয়, তাদের অন্তর এক।

তুর্কী আক্রমণের অব্যবহিত পর থেকে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সূচনা। গোপাল হালদার বলেন—'মধ্যযুগ বলতে ভারতের ইতিহাসে সাধারণভাবে বোঝায় 'মুসলমান রাজত্বকাল' (খ্রীঃ ১২০৬ থেকে খ্রীঃ ১৭৬৫ পর্যন্ত ; বা স্থূলভাবে খ্রীঃ ১২০০ থেকে খ্রীঃ ১৮০০)। স্মরণীয় যে, সচরাচর মধ্যযুগ বলতে 'সামন্ত সমাজের' কাল বোঝায়। কিন্তু ভারতে সামন্ত যুগের সূচনা হয়েছিল কুষাণ রাজত্বে (খ্রীঃ ৩০০ খ্রীঃ ৫০০)। তার প্রসার রাজপুত রাজাদের রাজত্বে (মোটের উপর খ্রীঃ ৭০০—খ্রীঃ ১২০০) এবং তুর্কি বিজয়ে (খ্রীঃ ১২০০) তা নবায়িত হয়। এর প্রথমার্ধ শেষ হয় (১৫২৬ খ্রীঃ)। মোগল রাজত্বের শেষদিকে (খ্রীঃ ১৭০০ থেকে) সামন্তবাদী সমাজের ক্ষয় প্রকট হয়ে ওঠে। তা চলে পরবর্তী একশত বছর। এই কালপর্বে রচিত যে বাংলা সাহিত্য তার অনেকটাই ছিল প্রাচীনতর ভাবনার অনুবর্তন। তবে তুর্কি আক্রমণ বাংলার সমাজ ও সাহিত্যকে যে তীব্র আঘাত দেয় তাতে বাঙালী জাতি ও সে জাতির সংস্কৃতি একটি বিশেষ রূপলাভ করে। এই সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন জানান—

"আর্য—অনার্যদের মধ্যে সংস্কৃতিগত ধর্ম বিশ্বাসগত আচার ও ব্যবহারগত এবং

Scanned with CamScanner

ভাবধারাগত এই যে স্তরভেদ ইহা বিলুপ্ত হইয়া অখণ্ড বাঙালী জাতি গঠিত হইয়া উঠিবার পক্ষে একটি প্রধান বস্তুর অভাব ছিল। দ্বিতীয় পক্ষের সংঘাত। বাংলাদেশ আর্য-অনার্য দুই স্তরের পরস্পর মিলনকল্পে তুর্কী অভিযানরূপে প্রচণ্ড সংঘর্ষের অপেক্ষা করিতেছিল। মুসলমান শক্তির মধ্যস্থতায় আর্য ও অনার্যের মিলন হইয়া বাঙালী জাতি বিশিষ্ট রূপ পাইয়া জন্মগ্রহণ করিল।" গোপাল হালদার তুর্কী আক্রমণের ফলে তিনটি অনিবার্য সামাজিক আবর্তনের কথা বলেছেন—

(ক) উচ্চ নিম্ন বর্গের হিন্দুদের মধ্যে সংযোগ নিকটতর হল।

(খ) পরাজিত হিন্দু সমাজ ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনা করতে সচেষ্ট হল।

(গ) এই তাগিদেই রচিত হল সেকালের বাংলা সাহিত্য। ইসলাম ধর্মের প্লাবনকে ঠেকাতে গিয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক যে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইল—সেই প্রেরণাতেই মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য দৃঢ়তর রূপ লাভ করল।

তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যের মতই বাংলার সেই যুগের কাব্য সাহিত্যও ধর্মীয় অনুভূতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ রচিত হয় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের দ্বারা। যোগ এবং চর্যার মধ্যদিয়ে জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়াই ছিল সাধকদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ধর্মকথা সেখানে প্রধান অবলম্বন হলেও সমাজ ও মানুষের কথা সেখানে কম নেই। চর্যার পদগুলির অর্থ ছিল দ্বিবিধ। বাইরের যে অর্থ তার মধ্যে মানুষের জীবনের বহু সুখ-দুঃখ বেদনা-বিরহ নানা অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের কথা বলা বা মানবতাবাদের কথা বলা সেই সব কবিদের উদ্দেশ্য ছিল না সত্য, কিন্তু রূপকের আড়ালে যে তত্ত্বকথা বা ঈশ্বর দর্শনের সংগীত তারা রচনা করেছিলেন তা তাদের অজান্তেই হয়ে উঠেছিল মানব জীবন কাব্য। তৎকালীন সমাজের মানুষের জীবনে যে দারিদ্র্য ছিল তা চর্যাপদের কবিরা অঙ্কন করতে ভুল করেননি। এই যে সমাজজীবন অঙ্কন তা পরোক্ষে মানবতাবাদেরই নামান্তর—

চর্যাপদে এটাও জানা যায় যে, সেকালের মানুষের মধ্যে উচ্চ-নিম্ন বর্গীয় ভেদাভেদ, বর্ণ ও ধর্ম ভেদ ছিল। কাহ্নপাদের একটি পদ থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ নর-নারীরা শবর, চাঁড়াল, ডোম, শুঁড়ি ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষকে ঘৃণা করতেন—

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই যাই সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ॥ (১০ নং চর্যা)

যাই হোক, চর্যার কবিরা যে নিছক ধর্মের কথা বলেছেন তা নয়, যে সমাজে তারা বাস করতেন সেখানকার মানুষের জীবনও তাদের কাব্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

মধ্যযুগের যে বাংলা সাহিত্য তা ছিল যেমন ধর্ম নির্ভর, তেমনি ছিল অলৌকিকতা ও অতিপ্রাকৃত রসে পরিপূর্ণ। এই সময়ে রচিত পৃথিবীর প্রতিটি সাহিত্যেই যে অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল তার মূল রস ছিল অদ্ভুত রস। অসম্ভব অলৌকিক এই সব কাহিনীকে ইংরেজীতে বলা হয় unnatural story বা miracle tale। তবে বাংলা সাহিত্যে যত না miracle tale এর প্রাদুর্ভাব ছিল, তার থেকে বেশী ছিল ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক উপাদান। দেবমাহাত্ম্য প্রচার কবিদের প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষ নিজেকে দেবতার ক্রীড়নক হিসাবেই দেখত। তাই সেই সাহিত্যে প্রধান ছিল দেবতার লীলা। এসেছে ধর্মকথা, পুরাণ কথা। অতিপ্রাকৃত শক্তির মহিমা কীর্তিত হয়েছে। ভাগ্যতাড়িত মানুষ ভগবৎ নির্ভর হয়ে দেব-পূজার মধ্য দিয়েই নিজের অসহায়তার

কথা বলেছে। সেই সঙ্গে অসহায় মানুষ পুরাণ কথা ব্যাখ্যার সাথে সাথে লোকায়তজীবনের ঐতিহ্যের কথা গোপন করেনি। ছোট ছোট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আঘাত, সামাজিক শৃঙ্খলাহীনতা মানুষের জীবনে সাময়িক কম্পন সৃষ্টি করেছিল। এই ধাক্কায় খানিকটা হলেও তারা আত্ম-সচেতন হয়। কখনো দেবতার কাছে প্রার্থনা করে, কখনো দেবতা নিজেই মানুষ হয়ে ওঠেন। এই লোকায়ত ধারায় যে সাহিত্য তা ছিল মানবমুখী সাহিত্য। তবে তা নিরপেক্ষ মানবতাবাদ নয়, দেববাদ নির্ভর মানবতাবাদ।

মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যের শাখা অনেকগুলি। আলোচনার সুবিধার্থে কতকগুলি পর্বে শাখাগুলিকে উল্লেখ করা হল। যথা—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন, বৈষ্ণবপদাবলী, চৈতন্যজীবনীকাব্য, শাক্তপদাবলী, আরাকান রাজসভার কাব্য, নাথসাহিত্য, মৈমনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গগীতিকা। এর মধ্যে আরাকান রাজসভার কাব্য ও পূর্ববঙ্গগীতিকা হল মানবজীবন রস নির্ভর ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য। বাকি সাহিত্য শাখাগুলির মূল অবলম্বন ও উদ্দেশ্য ধর্মকথা বিশ্লেষণ হলেও, এর মধ্যে কি প্রকারে মানব-জীবনরস প্রধান হয়ে উঠেছে-তা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য

আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যের অন্যতম নিদর্শন "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্য। উচ্চশ্রেণীর ধর্মতত্ত্ব একাব্যটির বিষয় হলেও ধীরে ধীরে নায়ক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পল্লী যুবক হয়ে উঠেছেন। এই কাব্যের জন্মখণ্ডে দেখা যায় কংসবধের জন্য কৃষ্ণ অবতার—

সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী।
অবতার করি করে ধরণীতে কেলি॥

কৃষ্ণের পর রাধার জন্ম—

কাহ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীকে বুলিল দেবগণে॥
আল রাধা পৃথিবীতে কর অবতার।
থির হউ সকল সংসার॥

এরপর ধরণীর ধুলিকণায় চরিত্র দুটির দেবত্ব ম্লান হয়ে আসে। পার্থিব মালিন্য ও বাস্তবের রূঢ়তায় কৃষ্ণ চরিত্রের অধিকতর হেনস্থা হতে দেখে কবি মধ্যে মধ্যে দেবত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী। সুতরাং রাধাকে না দেখলেও তার সঠিক সন্ধান বড়ায়িকে বলে দিয়েছে—"বকুল তলাত আছে সে সুন্দরী সতী।" বড়ায়ি রাধাকে বলেছে—

সে দেব সনে নেহা বাড়াইলে
হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী॥

কৃষ্ণ বহুবার নিজমুখে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে বলছে—"আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশ্বরে।" "শঙ্খ চক্র আহ্মে গদা সারঙ্গ ধরী।" আবার বলেছে—

বেদ উদ্ধারি লোঁ ক্রীড়া সাগর জলে
নীলা এ আহ্মে মুরারি
দৈত্য দলিলোঁ আসুর সংহারিলো
শঙ্খ চক্র গদা ধরী।

Scanned with CamScanner

দেবত্বের প্রশংসাপত্র কৃষ্ণ নিজে এবং বিভিন্ন চরিত্র বহুবার দাখিল করলেও কবির ভক্তি অর্ঘ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরণে কখনও অর্পিত হয় নি। স্বর্গ ও মর্ত্য যেন এপাড়া-ওপাড়া। কৃষ্ণের দেবত্বও মানবত্বের ভগ্নাংশ মাত্র। শ্রীরাধাকে অধিকার করার জন্য তার যে আকুলতা তা মানুষের আকুলতা। রাধাকে খুশী করার জন্য কৃষ্ণের ভার বহনে মর্ত্যবাসীদের সঙ্গে দেবতারাও হেসে ওঠেন—

হাসে দেবগণ দেখি রাধার চরিত।
কৃষ্ণক বহায়িল ভার কৈলে আনুচিত॥

কবি ধর্মের আবরণে জীবনের প্রেমকাহিনী রচনা করেছেন। নায়ক এখানে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ নন, পল্লী যুবক। এইকাব্যে বংশীখণ্ড থেকে শুরু হয়েছে লৌকিক প্রেমের প্রকৃত অভিসার। রাধার প্রণয় প্রার্থী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের জবরদস্তি, জুলুম, নাছোড়বান্দা মনোভাবের মধ্যে কোথাও অনন্ত মুরারী, দেব জগন্নাথকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বংশীখণ্ডের সেই অসাধারণ চরণগুলিও মর্ত্যপ্রেমের কাব্যিক লালিত্যে অনির্ব্বচনীয়—

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥

পরম প্রেমময়ের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে বড়র রাধিকার যে মুগ্ধতা তার মধ্যে ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য নেই। এখানে যে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বেণীমাধব বলাটাই ঠিক হবে। তার উদ্দেশ্যে বালিকা রাধার উক্তি—

'আন্তর সুখা এ মোর কাহ্ন অভিলাসে।'

কৃষ্ণের ভুবনমোহন বাঁশীর সুরে রাধার দৈনন্দিন কর্মের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়—

'আকুল শরীর মোর বে আকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলো রন্ধন॥'

শুধু তাই নয় রাধার এও মনে হয়—

'পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়া পড়ি জাওঁ।'

যাই হোক, ধর্মীয় মাহাত্ম্য বর্ণনার সুযোগে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যের কবি লৌকিক নর-নারীর জীবনেরই সুখ-দুঃখ, হৃদয়ের সংকোচন-প্রসারণ, যন্ত্রণা, আনন্দানুভূতি বর্ণনা করেছেন। এভাবেই মধ্যযুগের এই কাব্যটির মধ্যে মানব-ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অনুবাদসাহিত্যধারা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ শাখা অনুবাদ সাহিত্য। এই যুগে বাংলা ভাষায় 'রামায়ণ' মহাকাব্যের প্রথম অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা। এর নায়ক রামচন্দ্রের মধ্যে মহর্ষি বাল্মীকি যেভাবে দেবত্ব-কে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কৃত্তিবাস সেপথে হাঁটেন নি। একান্তই এটি বাংলার জীবনকাব্য। এই গ্রন্থে অযোধ্যার রাজপরিবারের সে মাহাত্ম্য ম্লান। মহর্ষির হাতে যা ছিল 'মহাকাব্য' কৃত্তিবাসের হাতে তা হয়ে উঠেছিল 'পাঁচালী'। যুদ্ধ নয়, রাজনীতি নয়, বাংলার গার্হস্থ্য জীবন—এর প্রধান আলোচ্যবিষয়।

রামায়ণ

কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র মহর্ষির নায়কের ন্যায় ক্ষত্রিয় বীর নন। নেই তাঁর পৌরাণিক গাম্ভীর্য,

বীরত্ব, কঠোরতা। তিনি কোমলতা, মাধুর্য্য ও বিনয়ের অধিকারী। সীতাকে বিসর্জন দিতে গিয়ে সাধারণ প্রেমিক যুবকের মত তিনি বিরহ বা বিলাপ প্রকাশ করেন—

আজি হৈতে গেল মোর ভোগ অভিলাষ,
আর না যাইব আমি সীতার নিবাস।
আজি হৈতে দূরে গেল সে সুখ সন্ধান,
আর না যাইব আমি জানকীর স্থান।

কৃত্তিবাসের আর এক আবিষ্কার কোমলময়ী, ধরিত্রীকন্যা, বাঙ্গালী বধূ, সংসারে শ্রী ও কল্যাণের অধিকারিনী জনক দুহিতা সীতা চরিত্র। পতিপ্রেম তাঁর কাছে পরম ধর্ম। বাল্মীকির সীতা তেজস্বিনী, ক্ষত্রিয় কন্যা, অনেকাংশে বীরাঙ্গনা সুলভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অনন্যা। কৃত্তিবাসের সীতা প্রেমময়ী, সহনশীলা, সতীনারী। তিনি পাতাল প্রবেশ কালেও পতীর প্রতি প্রেম জ্ঞাপন করে জানান—

"জন্মে জন্মে, প্রভু তুমি হয়ো মোর পতি,
আর কোন জন্ম মোর কোরো না দুর্গতি।"

কৃত্তিবাসের কাব্যের কোথাও শ্রীরামচন্দ্রকে নারায়ণের অংশ বলে মনে হয় না। তিনি শ্রেষ্ঠ রাজা, শ্রেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রেষ্ঠ পুত্র। স্বামী হিসাবে, প্রজাপালক হিসাবে, নীতিনির্ধারক হিসাবে তিনি মানুষের প্রতিনিধি। লক্ষণ আদর্শ বাঙালী দেবর। হনুমান বাঙালী ভৃত্য। লব কুশ দেবশিশু নয়, বাঙালী ঘরের দুই সন্তান। তাছাড়া কৃত্তিবাসের কাব্যের উদ্দেশ্য আর্য ও অনার্য শক্তির দ্বন্দ্ব দেখানো নয়। একান্তভাবে বাঙালী জীবন, ধর্ম, অনুশীলন, চর্চা-চর্যা, আশা-বিশ্বাস দেখানোতেই একাব্যের সার্থকতা। এটি পুরাণ আশ্রিত কাহিনী, বাকিটা কবি কল্পিত। রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য তিনি মানুষ। মানুষের কাব্য রামায়ণ। সীতা মানবী। লক্ষণ সুভ্রাতা। মানবতাবাদের এই জয়েই কৃত্তিবাসের কাব্যের সার্থকতা।

মহাভারত

অনুবাদ শাখার অন্যতম আর এক মহাকাব্য কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'। এখানে ব্যাসদেবের 'মহাভারত'-এর মত অস্ত্রের গর্জন নেই, রাজনীতির জটিলতা তীব্র নয়। গার্হস্থ্য জীবন ও ভক্তিরস এর প্রধান অবলম্বন। তবে এই ভক্তিরস পরিণতিতে মানবরসেরই নামান্তর হয়ে উঠেছে। এখানে সভাপর্বে দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার যে কলহ বর্ণিত হয়েছে তা সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের দুই সতীনের কলহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্রৌপদী ও হিড়িম্বা রক্ত-মাংসের মানবী। দ্রৌপদীর ত্যাগ-তিতিক্ষায় আত্মশুদ্ধি, কুন্তীর আর্তি, ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহান্ধতা, দুর্যোধনের শঠতা, চাতুর্য, কূট-কৌশল, পাণ্ডব-কৌরবের স্বার্থ-সংঘর্ষ, জীবনের জটিলতা বর্ণনায় কাশীরামের কাব্য দেববাদের আদর্শ-কে প্রতিষ্ঠা দেয় নি। জীবনের উপলব্ধিতে, মানবের জয় ঘোষণায় কবির প্রতিভা ব্যস্ত থেকেছে। তাই বাংলা কাব্যের আধুনিকতার অন্যতম পূজারী, নবজাগরণের অন্যতম নায়ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেছিলেন—

"হে কাশী কবীশদলে তুমি মহা-পুণ্যবান।"

শ্রীকৃষ্ণবিজয়

মালাধর বসু অনূদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থে ভক্তিরসের প্রাধান্য, শ্রীকৃষ্ণের বিজয় ঘোষণা

Scanned with CamScanner

তার অন্যতম উদ্দেশ্য। কৃত্তিবাস ও কাশীরামের মত গার্হস্থ্যধর্ম মালাধরের লেখনীতে প্রধান স্থান লাভ করতে পারেনি। তৎসত্ত্বেও জীবন-জিজ্ঞাসার বহু ইঙ্গিত সেখানে ধ্বনিত। শ্রীরাধিকা যখন বলেন—

অল্প ধনলোভ লোক এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধণ সখী ছাড়ি দিব কারে॥

তখন রক্তমাংসের মানবীর জীবনাকাঙ্ক্ষা অনিবার্যভাবেই ধ্বনিত হয়।

মঙ্গলকাব্য

তবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'ই হোক, আর অনুবাদ সাহিত্যই হোক না কেন, মানব-জীবন জিজ্ঞাসা, মানুষের জয় ঘোষণার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে স্থান মধ্যযুগের আর এক সাহিত্য শাখা মঙ্গলকাব্যের। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে সাধারণ মানুষ আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দেবীর চরণে শরণ নেয়। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক সঙ্কট এবং সর্বোপরি মগ ও পোর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে বিপন্ন মানুষ দেবীর চরণে শরণ নেন। রচিত হয় দেব-দেবীর প্রশস্তিমূলক একশ্রেণীর কাব্য—'মঙ্গল কাব্য'। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি মঙ্গলকাব্য এই শ্রেণীর অন্যতম উপশাখা।

মনসামঙ্গলকাব্য

'মনসামঙ্গল' প্রাচীন মঙ্গলকাব্য। মনসা দেবীর প্রশস্তিমূলক রচনা এটি। তার পূজা প্রচারের কাহিনী এই কাব্য। কিন্তু সেই পূজা প্রচারকে কেন্দ্র করে দেবী মনসার জয় এখানে প্রাধান্য পায় নি। বরং দেব-মানব যুদ্ধের কাব্য হয়ে উঠেছে 'মনসামঙ্গল'। চম্পক নগরের শ্রেষ্ঠ বণিক চাঁদ সওদাগর। জবরদস্তি তাকে দিয়েই পূজা প্রচার করতে চেয়েছিলেন দেবী। কিন্তু যে-কালে দেবীর ভয়ে ভীত ছিল মানবকুল, মানুষ নিজেকে ঈশ্বর-ঈশ্বরীর কৃপাপ্রার্থী ভাবত—সেই যুগে মনসার নির্দেশকে উপেক্ষা করে বণিক চাঁদ সওদাগরের জবাব—

যে হাতে পূজেছি আমি শিব শূলপাণি।
সে হাতে কেমনে পূজি চ্যাংমুড়ি কানি॥

এখানে চাঁদ সদাগরের বলিষ্ঠতার জয়, জয় পৌরুষের। দেবী মনসার কুটিল ষড়যন্ত্রের কাছে বারবার চন্দ্রধর-কে পরাজয় বরণ করতে হলেও, তিনি দৃঢ়কণ্ঠে মনসার প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করেছেন। বলেছেন—

কারে কি বলিব আমি নিজ কর্মফল।
দেবকন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল॥

চন্দ্রধরের মধ্য দিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্য মানবতাবাদের জয়গান পরিবেশন করেছে। চন্দ্রধরের পরিবারের প্রত্যেকের কথোপকথন, বুকভাঙা কান্না, তীব্র বেদনা, প্রেম-বিরহ পাঠকের জীবনে আদর্শ স্থানীয় হয়ে উঠেছে। চন্দ্রধর পিতা হিসাবেও আদর্শ। কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষীন্দরের আকস্মিক মৃত্যুতে পিতা চাঁদের শোক আমাদের ভারাক্রান্ত করে—

চান্দো বলে পুত্র চাহিনু গিয়া পাছে।
বিচারিয়া চাহি নাগ কোন খানে আছে॥

বিস্তর চাহিয়া তবে নাগ না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিলো চান্দো বিসাদ ভাবিয়া॥

অথবা

কোথা লখাই কোথা লখাই বলে সদাগর।
চম্পকের রাজা আমার বালা লক্ষীন্দর॥

সনকা আদর্শ মাতা। একান্ত বাঙালী নারী তিনি। পুত্র হারিয়ে তার আর্তনাদ পাঠককে বেদনাতুর করে তোলে—

সর্বগুণ বধূর তিলেক দোষ নাই।
যে বলিমু বধূর দোষ মৈলেক্ষে লখাই॥

তিনি ভক্তিপ্রাণা নারী। সরলা বাঙালী মাতার মত সংসারের কল্যাণের জন্য তিনিও ভক্তিপ্রাণচিত্তে মনসার পূজা করেন। চাঁদের সাথে মনসার বিরোধের তীব্রতা তাকে স্পর্শ করে না। ঘরে তার বিদ্রোহী স্বামী আর অন্যদিকে রুষ্টা মনসা। এর ফলে একে একে তাকে হারাতে হয় সাত পুত্র। প্রতিবাদের ক্ষমতা তার ছিল না। লক্ষীন্দরের মৃত্যু সংবাদ তাকে পাগলিনী করে। তাই তিনি তার বধূকে দোষারোপ করেন। কিন্তু এর মধ্যেও তাঁর স্বাভাবিক মাতৃধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকে। শুধু সনকা নয়, বেহুলাও ত্যাগে, প্রেমে, সাহসিকতায়, সংযমে অনন্যা এক নারী। দেবীর ষড়যন্ত্রের সাথে লড়াই করে তিনি তাঁর প্রেমকে জয়ী করেছেন। তিনি বলেছেন—

'সাহসে জিয়াব পতি'

তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। তবে এই জয়ের শক্তি মানুষের শক্তি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রেমিকা ও স্ত্রী রূপে বেহুলার স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে।

দেব-দেবী চরিত্র অঙ্কনেও এই কাব্যের কবিরা মানব-জীবনরস পরিবেশন করেছেন। দেবী মনসা কুটিল, ষড়যন্ত্রপ্রবণ। মানবীর পরিচ্ছদেই তাকে পাওয়া যায়। শিব বৃদ্ধমানুষ। তার সংসারের অভাব, কষ্ট, দারিদ্র্য কৃষিভিত্তিক বাঙালী জীবনের প্রতিরূপ। 'মনসামঙ্গল' তাই দেবীর পূজা প্রচারের কাহিনী হলেও, মানবতার প্রথম সুস্পষ্ট জয়েরও কাব্য। মানবতাবাদের ধারক-বাহক চাঁদ, তার উদ্দেশ্যে তাই একালের কবি কালিদাস রায় জানান—

"তুমি দেবতারো বড় এ যুগের অর্ঘ্য ধরো
বন্দী সাধু চন্দ্রধর বীর।"

চণ্ডীমঙ্গলকাব্য

'মনসামঙ্গল' কাব্যে মানবতাবাদের যে সদর্প জয় ঘোষিত হয় তার প্রতিষ্ঠা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে। এখানে শক্তিমাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে লৌকিক জীবনের কাহিনী অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশ্রিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রথম ভাগ 'আখেটিক' পর্বের 'দেবখণ্ডে' দেবী চণ্ডী সম্পূর্ণভাবেই পৌরাণিক দেবী দক্ষকন্যা সতী ও পরে হিমালয়-দুহিতা পার্বতীরূপে আবির্ভূতা। তপস্যার মাধ্যমে তিনি শিব-কে স্বামীরূপে লাভ করেন—এই পর্যন্ত পুরাণসম্মত। এছাড়া, তাঁর বিবাহাদি, পিতৃগৃহে স্বামীসহ বসবাস, মা মেনকার সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদ কিংবা কৈলাসে জীবন-যাপন প্রভৃতি বিষয়ে কবি মুকুন্দ দাস যে বিস্তৃত বিবরণ দান করেছেন, সবই একান্তভাবে মানবিক। শুধুই মানবিক নয়, উমা এই পর্বে একেবারে নিম্নবিত্ত গৃহস্থ ঘরের কন্যা ও বধূ। তার

Scanned with CamScanner

মধ্যে অলৌকিকত্বের ছিটেফোঁটাও কোথাও নেই। দোষে গুণে তিনি মূর্তিমতী একটি মানস-কন্যা। কালকেতু-ফুল্লরা উপাখ্যানে তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডের পিছনে রয়েছে স্নেহময়ী মানবীমাতার সদাসক্রিয় মন। পশুদের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে তাদের তিনি ভয়মুক্ত করেন। ফুল্লরা সুন্দরীকে বলেন—

"আজি হৈতে মোর ধনে আছে তোর অংশ।"

কালকেতুকে বলেন—বিনাশ করিব দুঃখ তোরে করি দয়া।"

এরপর ওদের দিলেন মাণিক্যের অঙ্গুরি ও সাতঘড়া ধন। গুজরাট বনকেটে তাঁর নির্দেশে কালকেতু গুজরাট নগর স্থাপন করলেন। কাব্যের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অলৌকিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে এর অবকাশেই রয়েছে মাতৃহৃদয়ের করুণা।

'দেবখণ্ডে' হরগৌরীর সংসার জীবন যাপনের মধ্যে রয়েছে বঙ্গীয় সমাজের প্রতিচ্ছবি। বাঙালী নারীর মতই দেবী পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি চেয়েছেন—

'অনুমতি দেহ হর যাইব বাপের ঘর
যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে।'

কেন দেবী পিতৃগৃহে-যেতে চাইলেন, তার কারণস্বরূপ তিনি জানান ঃ—

"সুমঙ্গল সূত্র করে আইনু তোমার ঘরে
পূর্ণ হৈল বৎসর পাঁচসাত।
দূর কর বিসম্বাদ পূরহ মনের সাধ
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত।"

একালের নারীর মনেও কি এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় না? শিব-পার্বতীর হিমালয় গৃহে বসবাস-এর মধ্যেও মানব-জীবন রস যথার্থ রয়েছে। —শিবের দুই সন্তান। মহেশ্বরের বর্ধিত সংসারের প্রতিপালনে দৈহিক ও আর্থিক ক্ষমতায় টান ধরে মেনকার। তিনি জানান—

"রান্ধি বাড়ি আমার কাঁকাল্যে হৈল বাত।
ঘরে জামাই রাখিয়া যোগাব কত ভাত॥

বিরক্ত হয়েছেন শ্বশুর হিমালয়ও. মেনকার কণ্ঠে তা প্রকাশিত—

'লোক লাজে স্বামী মোর কিছু নাহি কয়।"

স্বামীপুত্র নিয়ে রাগ করে গৌরী স্বামীগৃহে কৈলাসে চলে এলেন। কিন্তু মহাদেবের সামর্থ্য নেই সংসার প্রতিপালনের। তিনি ভিক্ষাজীবি হলেন—

কেহ দেয় চাল কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি
কুপী ভরি তৈল দেয় তেলী।

এই জীবনের চিত্র দারিদ্রপীড়িত মানবজীবনের প্রতীক। অলস মহাদেব চরিত্র গৃহস্থ বাঙালী পুরুষ। তিনি ভোজন রসিক। ঘরে খাদ্য নেই। কিন্তু তাঁর উপদেশে ভোজের যে তালিকা গৌরী পেলেন তাতে তিনি বিস্মিত হয়ে জানান—

"রন্ধন করিতে ভাল বলিলে গোঁসাই।
প্রথমে যে দিব পাতে তাই ঘরে নাই॥
আজিকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল।
তবে সে আনিতে পারি প্রভু হে তণ্ডুল॥

স্বামী-স্ত্রীর জীবনের এই চিত্রে দৈববাণী নয়, এ একেবারেই ভিক্ষাজীবি নিঃসম্বল মানব গৃহস্থ ঘরের শাশ্বত কান্না। কেবলমাত্র দেব-দেবী চরিত্র নয়, ভাঁড়ুদত্ত ও মুরারিশীল চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়েও মুকুন্দ মানবতাবাদের জয় ঘোষণা করেছেন। কালকেতু ও ফুল্লরার জীবন দারিদ্র্য-পীড়িত ব্যাধ জীবনের দুঃখে পূর্ণ। এভাবেই বাস্তব রস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দৈববাণী সম্পূর্ণ না হলেও অনেকাংশে তিরোহিত হয়েছে।

ধর্মমঙ্গলকাব্য

ধর্মের বেদীতলে বসে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচিত হলেও ধর্মঠাকুর লৌকিক দেবতা। রোগ-নিরাময় ও প্রজননের দেবতা তিনি। এই কাব্যের বিভিন্ন স্থানে সমাজ ও মানব জীবনের কথা থাকলেও বাস্তবরসের দিক থেকে 'চণ্ডীমঙ্গল'এর সমগোত্রীয় নয়। তবে কাব্যটির রোমান্টিকতা আছে। এর রঞ্জাবতী, কলিঙ্গা ও কানাড়া চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীজীবনের নানা সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে। মহম্মদ খান চরিত্র শঠতা ও ক্রূরতায় জীবন্ত। লাউসেন মানবিক গুণের অধিকারী।

অন্নদামঙ্গল কাব্য

'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ভারতচন্দ্রে-র 'অন্নদামঙ্গলে'র দেবতা ও মানুষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এই কাব্যের ভোক্তা সাধারণ মানুষ এবং কাব্যের দেব-দেবীরাও দেবতা নন, তারা মানুষ। মৃত্তিকালগ্ন মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি, কান্না-ই দেবতাদের চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে। অন্নপূর্ণার রূপবর্ণনা ও বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যার রূপ-বর্ণনার পার্থক্য অতি অল্পই। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেছেন নিজের অন্তরের ভক্তির তাগিদে নয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে। তাই কবি মঙ্গলকাব্য রচনা করলেও কাব্যে দেবতার কথা অপেক্ষা মানুষের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। শিব-অন্নপূর্ণা-নারদ-ব্যাসদেব-গঙ্গা সকলকেই ভারতচন্দ্র মানবিক গুণে ভূষিত করেছেন। শিবের হিমালয় যাত্রা, শিব বিবাহ, কোন্দল ও শিবনিন্দা, হর-গৌরীর কথোকপথন, হর-গৌরীর বিবাদ-সূচনা, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, ব্যাসের শিবীনিন্দা, ব্যাসের প্রতি গঙ্গার নিন্দা, ব্যাসের কৃত গঙ্গার প্রতি তিরস্কার প্রভৃতি অংশে দেবতাদের আচরণ পুরোপুরি মানবিক। কেননা, তাদের আচার-আচরণে মানবিক দোষ-ত্রুটিগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হরগৌরীর সংসার-কে অবলম্বন করে ভারতচন্দ্র একেবারে ঘরোয়া, মানবিক রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি চিৎশক্তির আধার, সেই শিব-কে ভিক্ষায় বেরতে হয়েছে। এমন কি খেদের সাথে বলতে হয়েছে—

"নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাধ করে একদিন পেট ভরে খাই॥"

শিব তার সংসারের দুঃখ কষ্টের জন্য গৌরীকেই দায়ী করেন। তিনি জানান—

"স্ত্রী ভাগ্যে ধন পুরুষ ভাগ্যে পুত্র॥"

শিবের কাছে গৌরী সুলক্ষণা নন। তাই যুক্তির তীক্ষ্ণ জালে, ব্যঙ্গের কষাঘাতে জর্জরিত করে গৌরী শিবকে বলেন—

Scanned with CamScanner

অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্বকালি ধন কই॥
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে॥

শিব-পার্বতির ঘরোয়া মানবিক জীবনের বিশ্বস্ত ছবি এঁকেছেন ভারতচন্দ্র।

ব্যাস কাহিনীতে গঙ্গা-ব্যাস প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র দেবতার মধ্যে মানবীয় দিকের ছবি এঁকেছেন। বিষ্ণুভক্ত ব্যাস শিবের নিগ্রহে অতিষ্ঠ হয়ে বিষ্ণুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন—

বিষ্ণুর দেখেছি গুণ নন্দী করেছিল খুন
কিঞ্চিৎ যোগ্যতা তার নাই।

ব্যাস ও গঙ্গার পারস্পরিক কথনে মানবীয় রূপই প্রধান হয়ে ওঠে। গঙ্গাকে তিনি জানান—

আমি যারে প্রকাশিনু আমি যারে বাড়াইনু
সেই মোরে তুচ্ছ করি কহে।
মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে
এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে।

গঙ্গার সতীত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে ব্যাস বলেন—

শান্তনু রাজারে লয়ে ছিলি তার নারী হয়ে
তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর বেটা।

গঙ্গাও ব্যাসের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করে জানান—

আমার জাতির দায় কে ধরিবে তোরে।
কোন্ জাতি তোমার বুঝাও দেখি মোরে॥

এখানে গঙ্গা দেবী নন, সামান্য মানবী। 'অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা' অংশে ভারচন্দ্র দেবীকে নামিয়ে এনেছেন ঈশ্বরী পাটনীর নায়ে। সেখানে তিনি গৃহবধূ। অন্নদার পরিচয় দান, ঈশ্বরী পাটনির খেয়া নৌকায় সশরীরে উপস্থিত দেবীর মানবী রূপকেই প্রকাশ করে—

"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥"

বৈষ্ণবপদাবলী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অমৃত সংগীত 'বৈষ্ণব পদাবলী'। শ্রীরাধা ও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে রচিত পদাবলী বা গানকে বৈষ্ণব পদাবলী বলে। তবে চৈতন্য বিষয়ক কিছু পদ-ও এই পদাবলীতে অন্তর্ভুক্ত। বৈষ্ণবদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ আর শ্রীরাধিকা লক্ষ্মী। তাই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী এক অর্থে ধর্মীয় কাব্য। দেব-দেবীর লীলা এর বিষয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবই খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। এই বৈষ্ণবদের কাছে বৈষ্ণব পদাবলী ছিল বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য। তাই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে জানান—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

শ্রীচৈতন্যের মধ্যে বৈষ্ণবরা 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন। ফলে বৈষ্ণবপদাবলী আধ্যাত্মিকতার কাব্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক আবেদনেরও বহুপরিচয় রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই মানবিকতার অনুসন্ধান করে 'সোনার তরী' কাব্যের 'বৈষ্ণব কবিতা'য় বলেন—

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান'।

এই আধ্যাত্মিকতা স্বীকার করে কবি পুনরায় প্রশ্ন করেন—

"একি শুধু দেবতার?
এ সংগীত রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের-
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা?"

এ কেবল ধর্ম সংগীত নয়। রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে মর্ত্যমানবের আহ্বান-আর্তনাদ-বিরহ-মিলনের ডাক শুনতে পান বলেই বৈষ্ণব কবিদের উদ্দেশ্যে জানান—

"সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?
.....
এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে!"

ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা না থাকলে সত্য-সত্যই এমন বিরহ-মিলনের পদ লেখা সম্ভব নয়। আমরা জানি যে, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখেরা ব্যক্তিজীবনে নারীর প্রেমে ছিলেন মুগ্ধ। আসলে সেই মুগ্ধতা যেন বৈষ্ণব পদাবলীর রূপকে পরিবেশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের কালে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব' ছিল না, ফলে তাদের পদে তত্ত্বের বন্ধন নেই। বিদ্যাপতির 'মাথুরে'র পদে রাধার কণ্ঠে যে হাহাকার ধ্বনি পরিবেশিত হয়েছে তা যে কোন বিরহিনী নায়িকার মর্মজ্বালা বলে মনে হয়—

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর॥

বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা'র পদের মধ্যে ভোগপ্রবণ মানুষের আত্মসমালোচনা ও বিবেক দংশনের কথা প্রকাশিত। চণ্ডীদাসের রাধার কণ্ঠস্বরে প্রকাশিত হয় প্রকৃত প্রেমিকার জীবন উপলব্ধির ভাষ্য—

Scanned with CamScanner

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।

তাঁর লেখা 'পূর্বরাগে' রাধিকা যেন একালের নারী। প্রেমের জন্য সমাজ, পরিবার, সংসার সে অবহেলা করে। প্রেমিকের কাছে আত্মনিবেদন করে। গোবিন্দদাসের 'অভিসারে'র রাধিকা লৌকিক নারী। তাঁর রাধিকার কৃচ্ছ্রসাধনা ও বাদলঘেরা বর্ষণমুখর অমানিশীথের রাত্রে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অভিসার যাত্রা কেবল অপূর্ব নয়, অনির্বচনীয় মানবিক আনন্দ দান করে—

কণ্টক গাড়ি কমল সমপদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

এই সাধনায় দেবত্ব নেই। সংগ্রাম ও একনিষ্ঠতা প্রধান। জ্ঞানদাসের রূপানুরাগের পদ কাব্য-সৌন্দর্যে অতুলনীয়। একজন নারীর রক্তমাংসের আকাঙ্ক্ষার তীব্র আকূতি সেখানে ধ্বনিত—

রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতিঅঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

এই অনুভূতির মধ্যেও নারীর চাওয়া-পাওয়া প্রধান হয়ে উঠেছে।

বলরাম দাসের কিছু বাৎসল্য রসের পদে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন অসাধারণ মানবিক মহিমা লাভ করেছে। এখানে গোপাল ননী চুরি করে খেয়ে ধরা পড়ে গেছেন। তার শাস্তি-স্বরূপ মা যশোদা ছাগল-দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। এর ফলে অভিমানাহত বালক কৃষ্ণ মানব-শিশুর মত জানান—

"বলাই খায়্যাছে ননি মিছা চোর বলে রাণী
ভাল মন্দ না করি বিচার।
পরের ছাওয়াল পাইয়া মাঝে আসেন ধাইয়া
শিশু বলি দয়া নাহি তার॥"

এই পদটিতেই নয়, গৌড়াঙ্গ বিষয়ক পদেও কবিরা অনুরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। নিমাই-এর গৃহত্যাগের পর মাতা শচী দেবী শ্রীবাস পত্নী মালিনীকে যে স্বপ্নের কথা জানান তাতে ধর্ম কোথায়? মানুষের কথা—

আজিকার স্বপ্নে কথার শুনলো মালিনী সই
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া গৃহপানে নেহারিয়া
মা বলিয়া ডাকিল আমারে।

'শ্রীচৈতন্যজীবনী' কাব্যগুলিতেও চৈতন্যনামক একজন মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে জীবনচরিত লেখা হল। জীবনচরিত এভাবেই মধ্যযুগের কাব্যধারায় মানবতাবাদের বীজ বপন

করল। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" ছাড়া বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস এবং জয়ানন্দের কাব্য প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বনিরপেক্ষ মানুষের জীবন কাব্য হয়ে উঠেছিল। সমকালীন নবদ্বীপের পাণ্ডিত্য-গর্বী ব্রাহ্মণদের অহংকার, বৈষ্ণব-শাক্ত সম্প্রদায়ের বিরোধ, সুলতানি শাসনের নানা দিক, লোকায়ত বিভিন্ন ধর্মধারার ব্যাপক প্রসার, নবদ্বীপের সমৃদ্ধি এই সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ের কাব্য হয়ে ওঠে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ। জয়ানন্দের কাব্যে জানা যায় চৈতন্যের শেষজীবনের প্রামান্য কথা। জানা যায়, চৈতন্যের মানব-মুখী কর্মধারা। চৈতন্যের আবির্ভাবেই নব্য-মানবতাবাদের পরিবেশ বা জাগরণ সৃষ্টি হয় বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে।

শাক্তপদাবলী

শাক্তপদাবলীর কবিরা জগজ্জননী কালীমাতার উপাসক। তাদের কাব্যেও আছে তন্ত্রধর্মের বহু তত্ত্বকথা। তৎসত্ত্বেও তাঁরা বিষয় বিমুখ ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন সংসারের মানুষ। এই কাব্যের দুটি শাখা। এক—আগমনী ও বিজয়া, দুই—ভক্তের আকূতি। উভয় শ্রেণীর পদেই মানব-জীবনের রূপকে তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। তবু তার অবকাশেই মানব জীবনের কথা বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। উমা-সংগীত বাঙালী ঘরোয়া জীবনের কাহিনী হয়ে উঠেছে। আগমনী ও বিজয়া গানে বাৎসল্য রসাশ্রিত মাতৃহৃদয়ের বেদনা প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে আদ্যাশক্তি পরমাপ্রকৃতিকে কন্যারূপে ভজনা করা হয়েছে। কৈলাসপতি শঙ্করের সাথে বিবাহ হলেও মাতা মেনকার শঙ্কা দূরীভূত হয় না। তিনি গিরিরাজ হিমালয়-কে তাগিদ দেন—তিনি যেন অবিলম্বে কৈলাসে গিয়ে কন্যা উমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন—

যাবে যাবে বল গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হৈয়াছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে॥

এখানে মেনকা দেবী নন, বাঙালী মাতা। উমা ঘরে এলে তিনি জানতে চান—

কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা
ভিখারি হরের ঘরে?

উমা প্রত্যুত্তরে যা জানান তাতে তাকে বাঙালী বধূ বলেই মনে হয়—

কে বলে দরিদ্র হর রতনে রচিত ঘর
জিনি কত সুধাকর শত দিনমণি।

হিমালয় এখানে বাঙালী পরিবারের অলস, কর্মবিমুখ পিতা। স্বর্গীয় মাহাত্ম্য তাদের নেই। তাই 'উমাসঙ্গীত' যেন গার্হস্থ্য জীবনের কাব্য। তা আরও শক্তিশালী প্রমাণিত হয় মেনকার নিম্নোক্ত বক্তব্যে—

(গিরি) এবার তোমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না,
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া জামাই বলে মানবো না॥

শাক্ত-পদাবলী-র ভক্তের আকূতি পর্যায়ের পদের মধ্যে মাতৃসাধনার সাথে সাথে সংসার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত মানুষের কথা প্রধান হয়ে উঠেছে। এখানে ভক্ত মাতার নিকট আত্মসমর্পণ

Scanned with CamScanner

করেছেন 'অমৃত' লাভের জন্য নয়, সামাজিক -রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে। তাই তো রামপ্রসাদ জানান—

"কোন্ অবিচারে আমার পরে, করলে দুঃখের
ডিক্রি জারি"

মাতার কাছে আশ্রয় চায় পুত্র, কিন্তু দেশে উচ্ছৃঙ্খলতা, শোষণ, অবিচার বেড়ে যায়। তাই দেবী-কে আঘাত করে কবি বলেন—

"কুপুত্র অনেক হয় মা কুমাতা নয় কখন তো"

ফলে এই কাব্য মাতা-পুত্রের কথোপথনের কাব্য হয়ে ওঠে। মাতার প্রতি পুত্রের অভিযোগ ও আশ্রয় প্রার্থনায় ধর্মের সংকীর্ণতা নেই।

আরাকান রাজসভার কাব্য

সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক উপাদানে সমৃদ্ধ সাহিত্য 'আরাকান রাজসভার কাব্য'। এই যুগের অন্যতম দুই কবি—সৈয়দ আলাওল ও দৌলত কাজী। দৌলত কাজীর অন্যতম রচনা হল 'সতীময়না' বা 'লোরচন্দ্রানী'। এটি লৌকিক প্রেমের কাব্য। ময়না-লোর-চন্দ্রানী এই ত্রিমুখী প্রেমের কাহিনী এটি। প্রেমের জন্য এসেছে যুদ্ধ। যুদ্ধে জয়ী হয়ে বামণপত্নী চন্দ্রানীকে লাভ করেছেন লোর। আর লোর-পত্নী ময়না অপেক্ষার আগুনে দাহ হয়েছে। ময়নমতী সখী মালিনীকে জানান—

মালিনি কি কহব বেদন ত্তর।
লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর।।

দৌলত কাজীর কাব্য মানব-জীবন নির্ভর। অসাধারণ কিছু নীতিবচন এই কাব্যকে মানবিক করেছে—

ক) "যাহার নাহিক লজ্জা, কি ফল গঞ্জনা
তস্করেতে ধর্মকথা বেশ্যাকে ভৎর্সনা।।"

খ) "জীবন যৌবন ধন না রহিব সর্বক্ষণ
অমর হইব উপকারে।"

সৈয়দ আলাওলের লেখা কাব্যগুলি হল—'পদ্মাবতী', 'হপ্তপয়কর', 'সেকেন্দার নামা', 'সয়ফুলমূলক বদিউজ্জমাল' ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রথম কাব্যটি সার্থক প্রণয় আখ্যান। পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য রত্নসেনের দুঃসাহসিক অভিযান বর্ণনা, পদ্মাবতীর সৌন্দর্য বর্ণনা, সতীত্বরক্ষার বিবরণ অপূর্ব ভাষায় বর্ণিত। এইসব রচনা গুলিতে অলৌকিকতা নেই। কোন কোন স্থানে সুফী ধর্মের কথা বড় হলেও তা উদারতায় পূর্ণ।

মৈমনসিংহ গীতিকা

অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'লোকসাহিত্য'। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গের 'মৈমনসিংহ' জেলায় পাওয়া 'মৈমনসিংহ গীতিকা' অন্যতম। চন্দ্রকুমার দে এই গীতিকাটি সংগ্রহ করেন। 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'কঙ্ক ও লীলা', 'ভেলুয়াসুন্দরী' ইত্যাদি কাব্যে কখনও আচার ও হৃদয়, সংস্কার ও প্রেম দ্বন্দ্বে জর্জরিত। প্রথার কাছে, আচারের কাছে, ধর্মের সংকীর্ণতার

কাছে প্রেম আঘাত পেয়েছে। মহুয়া ও নদের চাঁদ প্রেমকে সফল করার জন্য ছেড়েছে ঘর, ছেড়েছে জাত, ধর্ম, সম্প্রদায়ের বন্ধন। শেষপর্যন্ত তাদের জীবন কে কেড়ে নিয়েছে হুমরা বেদের দলবল। তাদের মৃত্যু হলেও প্রেম অমরত্ব লাভ করেছে। তাইতো আমাদের কণ্ঠস্বরে বারংবার ভেসে ওঠে মহুয়া ও নদের চাঁদের সেই অবিস্মরণীয় উচ্চারণ—

মহুয়া—লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর।।

প্রত্যুত্তরে নদের চাঁদ জানায়—

কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি।।

'মলুয়া' পালায় মলুয়া ও চাঁদ বিনোদের প্রেম আকর্ষণীয়। মলুয়ার প্রেম সমাজের অবিচারে ব্যর্থ হয়ে যায়। মলুয়ার সতীত্ব অসাধারণ। 'কঙ্ক ও লীলা' কাব্যের নায়ক-নায়িকা একে অপরের কাছে যে ভাষায় প্রেম নিবেদন করে তার কাব্য সৌন্দর্য অতুলনীয়। গর্গ এখানে লীলা ও কঙ্কের প্রেমে বাধা। কঙ্কের বিচ্ছেদে লীলার বিরহ মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। করুণনিবেদন ধ্বনিত হয়েছে তার কণ্ঠে—

কহিও কহিও ঠাকুর আরে তুমি দিনমণি।
যাহার লাগিয়া আমি হইনু পাগলিনী।।
লাগাল পাইলে তারে আমার কথা কইও।
আলোক চিনাইয়া পথ দেশেতে আনিও।।

উপসংহারে বলা যায় যে, মানবতাবাদ কথাটি ইতালির 'রেনেশাঁস' জাত। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এরূপ কোন তীব্র সামাজিক-আন্দোলন হয় নি। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ এই ভাষার মধ্য যুগের সাহিত্যে অনুসন্ধান ভুল হবে. মনে রাখতে হবে, ধর্ম এবং দেববাদ সেকালে ছিল মূল কথা। কিন্তু সেকথা বলতে গিয়েই কবিরা মানুষের জীবন-কে অস্বীকার করতে পারেন নি। সেই সূত্রে এসেছিল মানুষের কথা। যুগ যত এগিয়ে চলে, লেখকের চেতনাও বিবর্তিত হয়। চেতনার বিবর্তন সূত্রেই শেষ পর্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'মঙ্গলকাব্য', এবং 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র মানবজীবনরস ভিন্ন ধর্মী হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে একথা স্মরণযোগ্য যে, ইউরোপে সামাজিক বিবর্তন যত দ্রুত হয়, এদেশে তা হয়নি। ফলে ইউরোপীয় মানবতাবাদ-এর কথা ভেবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের মানবতাবাদ-এর অনুসন্ধান ঠিক নয়। এদেশের সমাজ, মানুষের মন, ধর্মীয় চেতনার বিবর্তন, ইত্যাদির ওপর নির্ভর করেই বলা যায়, এ মানবতাবাদ "দেববাদনির্ভর মানবতাবাদ"।

এই প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা যায় :

- মধ্যযুগের আখ্যানকাব্য
- মধ্যযুগের খণ্ডকবিতা

Scanned with CamScanner